স্বাধীনতা-চিন্তার চতুষ্কোণ
(গান্ধীজী - নেতাজী - জিন্না - মানবেন্দ্র)

সুপ্রিয় মুন্সী

ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের গতি প্রকৃতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে রাজনৈতিক আন্দোলনের পাশাপাশি দেশ ও সমাজ পুনর্গঠনের একটি আন্দোলনও এখানে সংঘটিত হয়েছিল এবং নেতৃবৃন্দ তাঁদের নিজ নিজ ভাবনা অনুযায়ী স্বাধীনোত্তর দেশের রূপরেখা নিজেদের মনে এঁকে রেখেছিলেন বা ব্যক্ত করেছিলেন। এই বিষয়ে যাঁরা বিশেষভাবে সচেষ্ট হয়েছিলেন, বিশেষ করে এই শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে, তাঁদের মধ্যে অন্যতম মহাত্মা গান্ধী ও নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু। স্বাধীনোত্তর ভারত কি রকম হতে পারে তা তাঁদের কার্যক্রম, বক্তৃতা ও রচনা থেকে আমরা জানতে পারি ও বর্তমানে দেশের যে পরিস্থিতি তা তাঁদের ইপ্সিত দেশের কতো কাছাকাছি তা-ও এ থেকে জানা যেতে পারে।

এছাড়াও মৌলিক চিন্তবিদ হিসাবে নবমানবতাবাদের উদগাতা মানবেন্দ্রনাথ রায়ের পরিকল্পনা ও স্বাধীন পাকিস্তানের অন্যতম জন্মদাতা মহম্মদ আলী জিন্নার স্বাধীন দেশ সম্বন্ধে চিন্তা আমরা বিবেচনা করতে পারি। মানবেন্দ্রনাথ রায়ের বিভিন্ন লেখা, যার মধ্যে জ্ঞপিপলস্ প্ল্যানঞ্চ ও নবমানবতাবাদ দর্শনের বিভিন্ন সূত্র রয়েছে, তাদের থেকে এই বিষয়ে তাঁর ধ্যান-ধারণা জানা যায়। আর জিন্না সাহেবের ভাবনা স্বাধীনতার পর পরেই নবগঠিত পাকিস্তানের আইনসভায় প্রদত্ত ভাষণ থেকে পাওয়া যায়। তার পূর্বে পাওয়া যায়নি তার কারণ পাকিস্তান হবেই এ বিষয়ে বোধ হয় তিনি নিশ্চিত ছিলেন না। মজার কথা হলো যে আপাতভাবে যে তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে পাকিস্তান লাভ হলো, অর্থাৎ 'দ্বিজাতি-তত্ত্ব', তা সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত ছিল জিন্না সাহেবের এই বক্তৃতায়।

তবে এটি নিশ্চিতই যে কেবলমাত্র গান্ধীজী তাঁর 'সত্যাগ্রহ' আন্দোলন ও 'গঠন মূলক কার্যক্রমের' মাধ্যমে মানুষের মানসিকতার পরিবর্তন ও সমাজ পুনর্গঠনের কাজ সমান্তরালভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে চালিয়ে যাচ্ছিলেন - যাতে পরবর্তী পর্যায়ে কোন ফাঁক না থাকে ও 'সর্বোদয়' স্থাপনের অন্তরায়গুলি অনায়াসে দুর করা যায়। এ বিষয়ে আরো একটি দিক আমরা লক্ষ্য করতে পারি যেটি হলো

গান্ধীজীই একমাত্র ব্যক্তি ও নেতা যিনি সারা দেশ ঘুরে দেশ ও দেশের মানুষের চরিত্র ও প্রয়োজনকে সম্যকভাবে বুঝতে পেরেছিলেন, যেটি অন্য তিনজন করেননি। এই জন্যেই গান্ধীজী সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে আত্মিক যোগসূত্র স্থাপন করতে পেরেছিলেন এবং আজো মনে হয় যে দেশের বর্তমান অবক্ষয়ী পরিস্থিতির উদ্ভবই হতো না যদি তিনি বেঁচে থাকতেন।

অবশ্য নেতাজী গ্রামে-গঞ্জে, ভারতের বিভিন্ন স্থানে আন্দোলনের কাজে ঘুরেছেন এবং মানবেন্দ্রনাথ তাঁর ছোটবেলায় দেখা দেশটিকে ভোলেননি বলেই পরবর্তী পর্যায়ে পরিকল্পনা করতে গিয়ে এর সঠিক প্রয়োজনের উপরেই জোর দিয়েছেন। এছাড়াও তাঁদের ও জিন্না সাহেবের বৈদগ্ধ এবং সমাজ ও মনুষ্য-চরিত্রের গতি প্রকৃতি ও পরিস্থিতির সঠিক 'রিডিং' বা মূল্যায়ন স্বাধীনোত্তর দেশ গড়ার কাজে চিন্তা কার্যক্রম তৈরীতে যথেষ্ট সহায়াতা করেছে। আশ্চর্যজনকভাবে এঁরা চারজনেই দেশের মানুষের নৈতিক চরিত্র গঠনের উপর জোর দিয়েছেন - ব্যাপক দুর্নীতি বিষয়ে খুবই ক্ষুব্ধ হয়েছেন।

আমরা এখন চার নেতৃবৃন্দের নিজেদের কথাতেই তাঁদের চিন্তা অনুযায়ি দেশের ভবিষ্যৎ রূপরেখা নিয়ে আলোচনা করতে পারি। আলোচনার প্রাক্কালে একটি কথা আমাদের স্মরণ রাখতেই হবে যে এঁদের কেউই স্বাধীনোত্তর দেশ গড়ার কাজে নিজেদের নিয়োজিত করতে পারেননি কারণ হয় পূর্বেই বা পরেই মারা যান। মানবেন্দ্রনাথ অবশ্য বেশ কিছু বৎসর জীবিত ছিলেন, কিন্তু বিবিধ কারণে, বিশেষ করে পরে শারীরিক পরিস্থিতি কার্যক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্ট করেছে।

মহাত্মা গান্ধী : মহাত্মা গান্ধীর 'হিন্দ স্বরাজ' পুস্তক, 'আমার স্বপ্নের ভারত' রচনা ও পন্ডিত জওহরলাল নেহেরুকে লেখা ১৩ই অক্টোবর ও ৫ই নভেম্বর ১৯৪৫ সালের দুটি চিঠির সংযোজনে একটি পুর্ণচিত্র ও রূপরেখা আমরা পাই। এছাড়াও ঈষোপনিষদের প্রথম শ্লোকটি তাঁর প্রস্তাবিত সমাজের একটি রূপরেখা হতে পারে:

"ইশা বাস্যং তদম সর্ব্বম্, যৎকিন্চিত জগত্যাম জগৎ।
তেন তক্তেন ভূঞ্জিথাঃ মা গৃধ কস্যচিৎ ধনম্।।"

পূর্বোল্লখিত ‘আমার স্বপ্নের ভারত’-এ তিনি লিখেছেন, “ভারত মুখ্যতঃ কর্মভূমি, ভোগভূমি নয়।..... পৃথিবীতে ধর্মের (নৈতিক ও আধ্যাত্মিক, মানবিক মূল্য বোধের) শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করার কাজে ভারতই উপযুক্ত।..... এমন এক ভারত সৃষ্ট হবে যেখানে কোন রকম দাসত্ব থাকবে না; দরিদ্রতম ব্যক্তিও অনুভব করবে যে এ তারি দেশ এবং এর উন্নতির জন্যে তার মতামতও যথাযোগ্য মর্যাদা পাবে। উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র, নারী-পুরুষ কোন ভেদাভেদ থাকবে না, সকলেই সমান অধিকার পাবেন। সকল সম্প্রদায় সৌহার্দ্র্যের মধ্যে বাস করবে, অস্পৃশ্যতার অভিশাপ বা সুরা ইত্যাদি মাদক দ্রব্যের স্থান থাকবে না, এবং বিশ্বের অপরাপর অংশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক হবে শান্তিপূর্ণ। সে কাউকে শোষণ করবে না বা নিজেও কারো দ্বারা শোষিত হবার সুযোগ দেবে না। সৈন্যবাহিনী যথাসম্ভব ক্ষুদ্র হবে এবং ভারতীয় জনসাধারণের কল্যাণের পরিপন্থী না হলে অভারতীয় স্বার্থসমূহকে সততার সঙ্গে যোগ্য মর্যাদা দেওয়া হবে।

স্বাধীন সমাজের মূল ভিত্তি হবে গ্রাম বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বশাসিত, স্বনির্ভর জনগোষ্ঠী, কিন্তু বিচ্ছিন্ন নয়, সহযোগিতা ও প্রয়োজন অনুযায়ী একে অপরের উপর নির্ভরশীল থেকে কেবল দেশের জন্য নয়, প্রয়োজনে সারা পৃথিবীর জন্যে এরা কাজ করবে ও চরম ত্যাগ স্বীকারও করবে। এখানকার অধীবাসীরা হবে সংস্কৃতিবান ও এই সমাজের মর্মবাণিকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করে তাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে তারা কাজ করে যাবে এবং প্রয়োজনে অন্যের স্বার্থে আত্মবলিও দিতে তৈরী থাকবে।

রাজনৈতিকভাবে অসংখ্য গ্রাম, ক্ষুদ্র জনপদ দ্বারা নির্মিত এই কাঠামো নিয়ত পরিবর্ধনশীল গ্রামগোষ্ঠী নিয়ে রচিত হবে। জীবন এখানে পিরামিডের মতো হবে না, যার চূড়া দাঁড়িয়ে থাকে তলদেশের শক্তিতে। এ হবে এক সামুদ্রিক বেষ্টনীর মতো, যার কেন্দ্র হবে প্রতিটি ব্যক্তি, নর-নারী নির্বিশেষে ন্যূনতম যোগ্যতাবিশিষ্ট যাবতীয় সাবালকের মতামত দ্বারা নির্বাচিত ৫ জনের একটি পঞ্চায়েত গ্রাম বা ক্ষুদ্র জনপদের শাসনকার্য চালাবে, যা এই দেশে অনেকদিন ধরেই প্রচলিত ছিল। ক্রমশঃ, পঞ্চায়েত থেকে অঞ্চল, জেলা, প্রাদেশিকসভা হয়ে কেন্দ্রে এক প্রকৃত গণতন্ত্র স্থাপিত হবে।

যে যন্ত্র দ্বারা শ্রমশক্তি বেকার হয় এবং মুষ্টিমেয় জনাকয়েকের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়, তার স্থান এই নবভারতে থাকবে না। অর্থাৎ সর্ববিষয়ে বিকেন্দ্রীত ব্যবস্থাই মূলত অনুসারিত হবে এবং সহযোগী এক শিক্ষা ব্যবস্থা (নঈ তালিম), যা একটি বিশেষ স্তর পর্যন্ত আবশ্যিক হবে, এটিকে সম্ভব করে তুলবে।”

আরো বিশ্লেষণ করলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কল্যানকামী দিকগুলিকে ব্যবহার করে জনগণবহুল উৎপাদন নয়, তাদের ন্যূনতন প্রয়োজন ভিত্তিক উৎপাদন এখানে হবে, কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয় মালিকানায় বৃহৎ শিল্প সংঘটিত হবে এবং ভোগ্য পণ্যের প্রতি চাহিদা উৎসাহিত হবে না। বিপুল ও ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ও তার জন্যে বিবিধ সমস্যা সম্বন্ধে গান্ধীজী সচেতন ছিলেন এবং এর নিয়ন্ত্রনের কথাও তিনি বলেছিলেন। "সহজ জীবন, উচ্চ-চিন্তন", ঋষি বাণী অনেক ভারতীয় মণিষীর মতো গান্ধীজীকেও প্রভাবিত করেছিল।

স্বদেশের বাস্তব পরিস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন গান্ধীজী এমন একটি রাষ্ট্র-ব্যবস্থার কথা চিন্তা করেছিলেন যেখানে অমানবিক কাজকর্মের সুযোগ থাকবে না (গান্ধীজী এগুলিকে 'মনস্তাত্বিক বিকার' বলেছেন), সতত পালিত একাদশ ব্রত এবং গঠনমূলক কার্যক্রমে নিয়োজিত দেশবাসী এই আদর্শকে বাস্তবায়িত করতে পারবেন বা অন্ততঃ এর কাছাকাছি যেতে পারবেন এই বিশ্বাস ছিল তাঁর। অবশ্য এইরকম সমাজের রক্ষাকবচ হলো সারা পৃথিবী জুড়ে ক্রমশহ একই পরিকাঠামো ব্যবস্থা সৃষ্টি করা, অর্থাৎ গান্ধীজীর 'পৃথিবী হবে একটি যুক্তরাষ্ট্র' চিন্তাটিকে বাস্তবায়িত করা।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু : নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু হরিপুরা কংগ্রেসে (১৯৩৮) সভাপতি হিসাবে যে বক্তৃতা প্রদান করেন সেই থেকে স্বাধীন ভারত ও তার সরকার কিরূপ হবে বা বিভিন্ন কি নীতি ও কার্যক্রম গ্রহণ করবে তার একটি রূপরেখা আমরা পেতে পারি। ভারত যে বিভক্ত হতে পারে তার একটি লজিক্যাল কনক্লুশন্ ব্রিটিশ নীতি থেকে তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। এবং সেইজন্যে বক্তৃতার শুরুতেই সংখ্যালঘুদের আশ্বস্ত করে বলেছিলেন তাঁদের সহযোগিতা ও শুভেচ্ছা ছাড়া ভারতীয় জনগণের ভালো করা যাবে না।

আমরা জানি যে গান্ধীজী চেয়েছিলেন স্বাধীনতা অর্জনের পরে কংগ্রেসকে একটি দল হিসাবে না রেখে লোকসেবক সংঘে পরিণত করতে যাতে দলীয় যে ত্রুটিগুলি আমরা সাধারণত দেখে থাকি তা যাতে দেশ গড়ার কাজে ব্যাঘাত না করে। কিন্তু সুভাষচন্দ্র চেয়েছিলেন যে স্বাধীনতার পরে দেশের হাল কংগ্রেসই ধরবে এবং যেহেতু কংগ্রেসের ভিত্তিভূমি গণতান্ত্রিক এটি কখনোই স্বৈরাচারী হবে না ও দেশের শাসন ব্যবস্থাও স্বৈরাচরী হবে না। তাছাড়া অন্যদল তো থাকবেই এবং নেতারা নির্বাচনের মাধ্যমেই সরকারে আসবেন। তাঁদের উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া হবে না। অর্থাৎ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাই এখানে প্রচলিত হবে।

এরপরে দেশের পুনর্গঠনের কাজে মূল সমস্যাগুলি কি ও কিভাবে তা দূর করা যাবে বলতে গিয়ে তিনি জাতীয় পরিকল্পনার কথা বললেন। একটি জাতীয় কমিশন গড়ার কথা বললেন যাঁরা এই বিষয়ে নীতি নির্ধারণ করবেন ও কার্যক্রম সংগঠিত করবেন এবং যা সবসমেই সমাজবাদী ধারাতেই করা হবে।

তিনি বললেন এখানে সমস্যা হলো দারিদ্য যা দূর করতে হলে জমি-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করতে হবে ও জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত হবে। কৃষি মূল উপজীব্য, তাই তা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। কৃষিঋণ মকুব করা হবে, গ্রামের জনগণ সহজেই ঋণ পাবেন এবং সমবায় প্রথার ভিত্তিতে উৎপাদনকারী ও ব্যবহারকারীরা উভয়েই উপকৃত হবেন।

রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে শিল্পের ব্যাপক উন্নতি ও প্রসার ঘটবে, তবে জনসংখ্যার চাপ ও হার কমাতে না পারলে সব পরিকল্পনাই বিফল হবে বলে তিনি জানালেন।

বৈদেশিক নীতের বিষয় বলতে গিয়ে তিনি বললেন যে, অন্যদেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক অবশ্যই গড়ে তোলা হবে বা থাকবে, কিন্তু তাদের দ্বারা বা তাদের অভ্যন্তরীণ নীতি বা রাষ্ট্রব্যবস্থা আমাদের কোনভাবেই প্রভাবিত করবে না।

স্বাধীন ভারতের একটি জাতীয় ভাষা ও লিপির উপরে তিনি জোর দেন, যা জাতীয় ঐক্যকে সুদৃঢ় করবে।

মূলতঃ রাষ্ট্র-পরিচালনার বিষয়ে গণতান্ত্রিক সমাজবাদী বা সমন্বয়কারী এক ব্যবস্থার পক্ষে ছিলেন তিনি।

কায়েদ-এ আজম্ মহম্মদ আলি জিন্না : স্বাধীন পাকিস্তানের আত্মপ্রকাশের প্রাক্কালে করাচীতে আইনসভায় ১১ আগষ্ট, ১৯৪৭, নির্বাচিত সভাপতি, প্রকারান্তরে রাষ্ট্রপতি, হিসাবে কায়েদ-এ আজম্ মহম্মদ আলি জিন্না যে ভাষণ প্রদান করেন তার থেকে স্বাধীন দেশ সম্বন্ধে তাঁর ভাবনার কথা জানা যেতে পারে। সংসদীয় ব্যবস্থা অর্থাৎ স্বভাবতঃ গণতন্ত্রকেই পছন্দ করতেন তিনি, যদিও জমিদারী প্রথার বিলোপ তিনি চাননি। তবে আইন শৃঙ্খলা

বজায় রেখে দেশবাসীর জীবন, সম্পত্তি ও ধর্মীয় বিশ্বাস রক্ষার প্রাথমিক দায়িত্ব যে সরকারের তাতে তিনি প্রথমেই জোর দিয়েছিলেন।

সমস্যার কথা বলতে গিয়ে ব্যাপক ঘুষ, দিনীতি, কালোবাজারির কথা বললেন তিনি ও দৃঢ়হস্তে তাদের মোকাবিলা করার আহ্বান জানিয়ে বললেন যে খাদ্যাভাবের সমস্যা কিছুতেই দূর করা যাবে না যদি কালোবাজারি নির্মূল না করা যায়। এই প্রসঙ্গে আরো দুটি সমস্যার কথা বললেন তিনি - যেগুলি ন্যায় বিচারের ও সমসুযোগের ক্ষেত্রে অন্তরায় স্বরূপ - স্বজনপোষণ ও ব্যক্তিস্বার্থের জন্য অসদ্ আচরণ।

স্বাধীন দেশকে সুখী ও উন্নতশীল করার জন্যে দেশের মানুষের ভালো করতে হবে, বিশেস করে সাধারণ মানুষ ও গরীবদের দিকে সকলকে নজর দিতে হবে এবং সহযোগিতার ভিত্তিতে সকলকে কাজ করতে হবে।

এর পরবর্তী অংশটি আশ্চর্যজনক ও প্রায় বিস্ফোরক, যা বিশেষ করে মৌলবাদীদের চিন্তান্বিত করলো। জিন্না বললেন যে জাতি, বর্ণ, গোষ্ঠী বা ধর্ম নির্বিশেষে সকলেই এই রাষ্ট্রের নাগরিক এবং সকলেরই সমান অধিকার, সুযোগ ও দায়িত্ব থাকবে। তাহলেই দেশের সার্বিক উন্নতি হবে। এবং সব মানুষই স্বাধীনভাবে তাঁদের উপসনালয়ে যেতে পারবেন, কোন প্রতিবন্ধকতা থাকবে না।

দুর্ভাগ্যের বিষয় জিন্না শারীরিকবাবে খুবই অসুস্থ ছিলেন, যার জন্যে দেশ পুনর্গঠনে যেভাবে আত্মনিয়োগ করা দরকার তা তিনি পারেন নি। বৎসরখানেক পরেই ১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮, তিনি পরলোকগমন করেন।

আজন্ম বিপ্লবী মানবেন্দ্র রায় : মানবেন্দ্রনাথ ছিলেন বিদগ্ধ পন্ডিত ও কোন্ দর্শন বা মতবাদে ব্যক্তিমানুষ ও সমাজের প্রকৃত উন্নতি ও মুক্তি হতে পারে তারজন্যে তাঁর তাত্ত্বিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা এক গভীর অধ্যয়নের বিষয়। প্রায় শেষ পর্বে তিনি ছিলেন 'প্রকৃত' গণতন্ত্রের পূজারী ও প্রচারক এবং স্বভাবতই, রাজনৈতিক অথবা অর্তনৈতিক, উভয় ক্ষেত্রেই জনগণের পূর্ণ অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন তিনি।

'পিপল্‌স্‌ প্ল্যান' - এ তিনি লিখেছেন "এটি প্রায়ই বলা হয়ে থাকে যে ভারতের জনগণের দারিদ্র্য দূর করার একমাত্র উপায় হলো বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠার দ্বারা আমাদের দেশের প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগানোর ব্যবস্থা করা। এইমতটি একান্তই ভাসাভাসা এবং তাতে মাত্র অর্ধসত্যই প্রাকাশিত হয়। আর সকল অর্ধসত্যের মতোই এটি হল বিপজ্জনক .....ভারতে বৃহৎ শিল্পায়নের সর্বাপেক্ষা বড় বাধা হলো অধিকাংশ লোকের অতি সামান্য ক্রয়-ক্ষমতা। জনগণের ক্রয়-ক্ষমতা যদি বাড়াতে হয় কৃষির উপরেই গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ দেশের অধিকাংশই কৃষিজীবী।"

তাছাড়াও শুধুমাত্র মানুষের ব্যবহারের উদ্দেশ্যেই যদি উৎপাদন করা হয় তবেই ভারতে দ্রুত শিল্পায়ন সম্ভব, নতুবা নয়। অন্যকথায়, ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির নিয়মে চললে অর্থাৎ বাজারে বিক্রি করে লাভ করার উদ্দেশ্যে উৎপাদন করতে চাইলে দ্রুত শিল্পায়ন সম্ভব নয়।

রায় তৃতীয় বিশ্বময় যুদ্ধের আশঙ্কা করেছিলেন কারণ দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর পৃথিবী তাঁর মতে দুভাগ হয়ে গিয়েছিল - একদিকের নেতা আমেরিকা ও অপরটি রাশিয়া। সেইজন্যে যে কোন উপায়ে এই সর্বনাশকে ঠেকিয়ে রাখার প্রচেষ্টা করা উচিত। বিশেষ করে যুদ্ধের আয়োজনে ব্যয় করলে জগতের অর্থনৈতিক উন্নতি ব্যাহত হবে, মানুষের অন্ন-কষ্টের দুঃখ ঘুচবে না। আর স্বাধীনোত্তর ভারতের এই বিষয়ে একটি বড় ভূমিকা থাকবে। তাই তার উচিত এমন কোন কাজ না করা যাতে এই বিশ্বযুদ্ধ ত্বরান্বিত হয়; প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কোন পক্ষভুক্ত না হওয়া এবং সামরিক শক্তিরূপে নিজেকে গড়ে তোলার চেষ্টা না করা।

মানবতাবাদী দর্শনের ১৮ নম্বর সূত্রে মানবেন্দ্রনাথ তাঁর ঈপ্সীত নতুন সমাজের ছবি আঁকলেন অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় - "নতুন সমাজ ব্যবস্থার অর্থনৈতিক ভিত্তি হবে প্রয়োজন মেটানোর জন্যে উৎপাদন, লাভের জন্যে নয়। এবং বন্টন হবে মানুষের প্রয়োজন অনুসারে।

রাজনৈতিক সংগঠনে প্রতিনিধি মারফৎ শাসন-ব্যবস্থার কোন স্থানই থাকবে না কারণ এই ব্যবস্থায় সব ক্ষমতা চলে যায় প্রতিনিধিদের হাতে - জনসাধারণের হাতে কিছুই থাকে না। তারা চির নাবালকই থেকে যায়। সমস্ত প্রাপ্ত বয়স্ক লোকের দ্বারা নির্বাচিত ও প্রত্যক্ষবাবে পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েতের মারফৎ শাসনকার্যে অংশগ্রহণই হবে এই নতুনসমাজের রাজনৈতিক ভিত্তি। এই সমাজের সাংস্কৃতিক জীবন গড়ে উঠবে সার্বজনীন শিক্ষাবিস্তারের ওপর। এই শিক্ষাদনের নীতি হবে বৈজ্ঞানিক ও সৃষ্টিমূলক কাজে যথাসম্ভব কম

বাধানিষেধ আরোপিত হবে। যুক্তি ও বিজ্ঞান সম্মতভাবে গঠিত এই সমাজে অপচয় নিবারণের জন্যে একটি পরিকল্পনা রচিত হবে যা অবশ্যই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য অক্ষুন্ন রেখেই রচিত হবে। অর্থাৎ এই সমাজ সবদিক থেকেই গণতান্ত্রিক হবে - রাজনীতিতে হবে আসল গণতন্ত্র এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সবার অধিকার হবে সমান, কেউ কাউকে শোষণ করতে পারবে না। এবং যেহেতু এই গণতন্ত্রে সকল মানুষেরই জীবন উপভোগ্য ও সুখকর হয়ে উঠবে সেইহেতু বিপদকালে এই গণতন্ত্রকে নিজস্বজ্ঞানে সকলেই রক্ষা করতে এগিয়ে আসবে, এরজন্যে প্রাণপণ করবে।"

এই সমাজ কি বাস্তব? গান্ধীজীর মতো মানবেন্দ্রনাথও বিবর্তনে বিশ্বাসী ছিলেন, তাড়াহুড়োয় নয়। জনগণকে প্রকৃত অর্থে শিক্ষিত করে এই মুক্ত সমাজ গড়ে উঠবে, তার কর্মযজ্ঞের দায়িত্ব নেবেন অনাসক্ত, মুক্তবুদ্ধি মানুষ।

গান্ধীজীর মতোই তাঁরও পরিকল্পনা ছিল সারা বিশ্বের জন্যে - একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় পৃথিবীর পক্ষে। (ইংরাজীতে লেখা ও ভাষণ থেকে সহজ অনুবাদ বর্তমান প্রবন্ধকারের দ্বারা)।